الْمُهَذَّبُ مِنْ مَدَارِجِ السَّالِكِيْنِ গ্রন্থের অনুবাদ

পরিমার্জিত

মাদারিজুস সালিকীন

আল্লাহর পথে পথ চলতে একজন পথিককে যেসব মানযিলে অবতরণ করতে হয় তার সারগর্ভ বিবরণ

মূল : ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ ﵀
পরিমার্জন : শাইখ সালিহ আহমাদ শামি
অনুবাদ : মাওলানা আসাদ আফরোজ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

প্রিয় পাঠক, আপনি এখন যে বইটি অধ্যয়ন করছেন তা হলো :

اَلْمُهَذَّبُ مِنْ مَّدَارِجِ السَّالِكِيْنَ بَيْنَ مَنَازِلِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ﴾ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। মূলগ্রন্থ *'মাদারিজুস সালিকীন'*-এর রচয়িতা হলেন সপ্তম শতাব্দির বিখ্যাত আলিম ও দার্শনিক ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)। তার নাম শোনেননি এমন মানুষের সংখ্যা হাতেগোনা। তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ৬৯১ হিজরিতে সিরিয়ার দিমাশক শহরে। জীবনের পুরা সময়টাই তিনি দিমাশকে অতিবাহিত করেছেন। তার জীবনাবসানও হয়েছে সেখানেই ৭৫১ হিজরিতে। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ)-এর সুযোগ্য শাগরিদ। তার পিতাও ছিলেন তখনকার অনেক বড়ো একজন আলিম; যিনি দিমাশকের আল-মাদরাতুল জাওযিয়্যাহ-এর পরিচালক ছিলেন। এ কারণে তাকে বলা হতো قَيِّمُ الْجَوْزِيَّةِ (জাওযিয়্যাহর পরিচালক)। আর পিতার এই নামের সাথে যুক্ত করে তার ছেলে আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ (বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লেখক)-কে ডাকা হতো 'ইবনু কাইয়্যিমিল জাওযিয়্যাহ' (জাওযিয়্যাহ মাদরাসার পরিচালকের ছেলে) বলে।

'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থটিকে সংক্ষেপ ও পরিমার্জিত করেছেন আরবের বিখ্যাত আলিম, লেখক ও সাহিত্যিক সালিহ আহমাদ শামি[১]। হাফিজাহুল্লাহ। *মাদারিজুস সালিকীন* ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর মৌলিক কোনো একক রচনা নয়। বরং এটি শাইখুল ইসলাম আবূ ইসমাঈল আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ হারাবি[২] (রহিমাহুল্লাহ)-এর *'মানাযিলুস সায়িরীন'* গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা ও পরিপূরক এবং সেটিকে কেন্দ্র করেই লেখা। সালিহ আহমাদ শামি *'মাদারিজুস সালিকীন'* থেকে কেবল ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর কথা, মতামত ও সিদ্ধান্তগুলোই একত্র করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করে সাজিয়েছেন। *'মানাযিলুস সায়িরীন'* গ্রন্থের লেখকের কোনো অভিমতকে এখানে উল্লেখ করেননি। সুতরাং বলা যায়, অনূদিত এই গ্রন্থটির সম্পূর্ণ লেখাই ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর রচিত। আল্লাহ তাআলা মহান এই ইমামকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন

---

[১] তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার দিমাশ্ক শহরের বূমা নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ৫০ বছর বয়সে স্বপরিবারে সৌদি আরবে এসে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থান করছেন। তার রচনাবলির মধ্যে অন্যতম হলো :

١. مِنْ مَعِيْنِ الشَّمَائِلِ ٢. مِنْ مَّعِيْنِ السِّيْرَةِ ٣. اَلْجَامِعُ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ

[২] জন্ম ৩৯৬ হিজরি এবং মৃত্যু ৪৮১ হিজরি। তিনিও হাম্বালি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

লেখকের কথা

প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের অধিপতি। সুন্দর পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষমাণ, যারা আল্লাহর নাফরমানি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। শাস্তিলাভের উপযুক্ত তারাই, যারা জুলুমের পথে চলে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনি মহাবিশ্বের অধিপতি, তিনি সমস্ত রাসূলের ইলাহ্, আসমান-জমিনের পরিচালক। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাঁকে পাঠানো হয়েছে প্রাঞ্জল কিতাব দিয়ে, যা পার্থক্যরেখা টেনে দেয়—হিদায়াত ও ভ্রষ্টতার মাঝে, সঠিক পথ ও ভুল পথের মাঝে, নিশ্চিত জ্ঞান ও সংশয়ের মাঝে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন এ উদ্দেশ্য নিয়ে—আমরা যেন চিন্তাশীল মন নিয়ে তা পাঠ করি, সেখান থেকে অন্তর্দৃষ্টি লাভের চেষ্টা করি, তা থেকে উপদেশ নিয়ে ধন্য হই, এর সর্বোত্তম অর্থকে গ্রহণ করি, এর সংবাদগুলোকে সত্য বলে মেনে নিই, এর বিধিনিষেধ বাস্তবায়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করি, এর বৃক্ষ থেকে উপকারী-জ্ঞান-সদৃশ ফল আহরণ করি—যা মানুষকে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে—আর এর বাগান ও পুষ্পরাজি থেকে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা-সদৃশ সুবাসিত উদ্ভিদ সংগ্রহ করি।

কুরআন আল্লাহর কিতাব, যা আল্লাহকে-চিনতে-ইচ্ছুক ব্যক্তিকে পথ দেখায়; এ হলো তাঁর দেখানো পথ, যা পথিককে তাঁর কাছে নিয়ে যায়; তাঁর স্পষ্ট আলো, যা অন্ধকার দূর করে দেয়; তাঁর দেওয়া রহমত, যাতে রয়েছে সৃষ্টিজগতের সবার কল্যাণ; তাঁর ও তাঁর বান্দার মধ্যে সংযোগকারী মাধ্যম, যখন অন্যসব মাধ্যম ছিন্ন হয়ে যায় তখন কেবল এ মাধ্যমটিই টিকে থাকে; আর (এ হলো) তাঁর কাছে পৌঁছার বিশাল প্রবেশদ্বার, সব দরজা বন্ধ হলেও এ দরজা কখনো বন্ধ হবে না।

কুরআনই হলো সেই সরল পথ, যে পথে চললে মানুষের চিন্তাধারা কখনো বিকৃত হয় না; সেই প্রজ্ঞাময় স্মারক যা থাকলে মন কখনো বাঁকাপথে যায় না; মহান আপ্যায়ন যার ব্যাপারে বিদ্বানরা কখনো তৃপ্ত হয় না; যার বিস্ময় শেষ হবার নয়; যার ছায়া কখনো সরে যাবে না; যার নিদর্শন অফুরন্ত; যার উত্থাপিত প্রমাণগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; এ কিতাব নিয়ে যত চিন্তাভাবনা করা হয়, হিদায়াত ও অন্তর্দৃষ্টি ততই বৃদ্ধি পায়; আর যখনই এর সরোবর উন্মুক্ত করা হয়, তখনই সেখান থেকে প্রবলবেগে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার ফোয়ারা ছুটতে থাকে।

কুরআন হলো চোখের অন্ধত্ব-দূরকারী আলো, অন্তরকে ব্যাধিমুক্ত রাখার ওষুধ, অন্তরের সঞ্জীবনীশক্তি, মনের প্রফুল্লতা, অন্তরের বাগিচা, আত্মাকে আনন্দময় জগতে প্রেরণের চালিকাশক্তি, আর সকালসন্ধ্যায় এ কথার ঘোষক—"সফলতা-সন্ধানীরা! সফলতার দিকে আসো!" সীরাতে মুসতাকীমের মাথায় দাঁড়িয়ে ঈমানের ঘোষক এভাবে ডাকছে—

يَا قَوْمَنَا أَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوْا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

“আমাদের স্বজাতির লোকজন! তোমরা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর ওপর ঈমান আনো, তা হলে তিনি তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদের মুক্তি দেবেন।”[৩]

সুবহানাল্লাহ! যারা ওহির মূলপাঠ এড়িয়ে চলে, যারা এর বিশাল জ্ঞানভান্ডারের কুলুঙ্গি থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করে না—তারা যে কী বিশাল জিনিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে!! অন্তরের জীবনীশক্তি, চোখের উজ্জ্বল জ্যোতি আরও কত কিছু যে তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে!!

যে তার রবের কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ থেকে দূরে থাকে, সে কি মনে করে—মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত মতামতের দোহাই দিয়ে তার রবের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে? অথবা প্রচুর জ্ঞান-গবেষণা, যুক্তিতর্ক, বুদ্ধিবৃত্তিক উদাহরণ ও রকমারি প্রশ্ন-উত্থাপন কিংবা ইশারা-ইঙ্গিত, লাগামছাড়া আলোচনা, নানারকম কাল্পনিক চিত্র উপস্থাপন—এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর শক্ত পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে?

আল্লাহর কসম! এ এক বিরাট ভুল ধারণা! যে এমনটা ধারণা করেছে, তার ধারণা জঘন্য মিথ্যা! তার মন তাকে অসম্ভব জিনিসের প্রবোধ দিয়েছে। বাস্তবতা হলো—নাজাত কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই নির্ধারিত, যে আল্লাহর দেখানো পথকে অন্য সবার মতের ওপর প্রাধান্য দেয়, তাকওয়ার রসদ সংগ্রহ করে, দলীলের অনুসরণ করে, সরল পথে চলে, আর ওহিকে এমন মজবুত রশি দিয়ে আঁকড়ে ধরে যা কখনো ছিঁড়বার নয়। আল্লাহ সব শোনেন, জানেন।

মূলকথায় আসি। মানুষের পূর্ণতা মাপা হয় উপকারী জ্ঞান ও ভালো কাজ—এ দুয়ের ভিত্তিতে; আর জিনিস দুটি হলো যথাক্রমে ‘হিদায়াত’ ও ‘দ্বীনে হক’। অন্যদের ভেতর পূর্ণতা আনতে হলেও, আনতে হবে এ দুটি জিনিসের মাধ্যমেই, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“শপথ মহাকালের! সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; ব্যতিক্রম কেবল তারা—যারা ঈমান আনে, ভালো ভালো কাজ করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয়, আর দেয় ধৈর্যধারণের পরামর্শ।”[৪]

আল্লাহ তাআলা শপথ করে বলেছেন—প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত, ব্যতিক্রম কেবল সে, যে তার জ্ঞানের শক্তিকে ঈমান দিয়ে পূর্ণ করে, কর্মের শক্তিকে পূর্ণ করে ভালো কাজের দ্বারা, আর অন্যকে পূর্ণতা দেয় সত্য-অনুসরণ ও ধৈর্যধারণ—এ দুয়ের উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে। (এখানে) সত্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও আমল; আর এ দুটি বিষয় পূর্ণতা পায় না, যতক্ষণ-না এ দুটি বিষয়ে ধৈর্য ধরা হয় এবং পরস্পরকে এ দুটি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। মানুষের দায়িত্ব হলো তার জীবনের সময়গুলো—বরং প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস—এমন কাজে খরচ করা যার মাধ্যমে সে তার সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে এবং যার দ্বারা সুস্পষ্ট ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে। আর তা কেবল তখনই সম্ভব, যখন সে কুরআনের দিকে এগিয়ে আসবে, তা

---

[৩] সূরা আহ্কাফ, ৪৬ : ৩১।

[৪] সূরা আসর, ১০৩ : ১-৩।

ভালোভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা চালাবে, তা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করবে, এর বিপুল সম্পদ লাভ ও এর গুপ্তধন উত্তোলনের উদ্যোগ নেবে, এর জন্য কষ্ট বরদাশত করবে এবং এর পেছনে সবসময় লেগে থাকবে। কারণ, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে কুরআনই হলো বান্দার কল্যাণের জিম্মাদার, এটিই তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবে, এটিই হাকীকত, এটিই তরীকত, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মহিমা-প্রকাশের সঠিক মাধ্যম এটিই। এ সবকিছুই নিতে হবে কেবল কুরআনের কুলুঙ্গি থেকে, আর ফল লাভের আশা করা যায় শুধু এরই বৃক্ষ থেকে।

আল্লাহর মদদে আমরা এ বিষয়ে (পাঠকদের) দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাচ্ছি। আর তা করা হবে কুরআনের মূল, সূরা ফাতিহা সম্পর্কে কিছু কথা বলার মাধ্যমে। (মানবজীবনের) লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আল্লাহর পথের পথিকদের বিভিন্ন মানযিল, আল্লাহর মারিফাত-লাভকারীদের অবস্থান, সেসবের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও উপকরণের মধ্যকার পার্থক্য, আল্লাহর দান ও নিজের উপার্জন—এসব ব্যাপারে এ সূরা যা ধারণ করেছে এবং তাতে যা বলা হয়েছে, তার ওপর আলোকপাত করা হবে। আর স্পষ্টভাবে দেখানো হবে, (এসব বিষয়ে) এ সূরার যে অবস্থান, অন্য কোনো সূরা-ই সেই অবস্থানে নেই; এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাওরাত ও ইনজীলে—এমনকি কুরআনেও—এর অনুরূপ কোনো সূরা নাযিল করেননি।

আল্লাহ তাআলাই সাহায্য-লাভের উৎস, ভরসা করতে হবে কেবল তাঁরই ওপর, মহামহিম আল্লাহ ছাড়া না আছে কারও কোনো শক্তি, আর না আছে কোনো সামর্থ্য।

***

প্রথম অধ্যায় : সূরা ফাতিহা সম্পর্কে আলোচনা

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴿٧﴾

"পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে। প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের অধিপতি, পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু, প্রতিদান দিবসের মালিক। আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই। আমাদের সরল পথ দেখাও—তাঁদের পথ, যাঁদের ওপর তুমি করুণা করেছ; ওদের পথ নয়, যারা (তোমার) ক্রোধের শিকার হয়েছে, ওদের পথও নয়, যারা ভুল পথে চলছে।"[৫]

[৫] সূরা ফাতিহা ১ : ১-৭।

প্রথম পরিচ্ছেদ : সূরা ফাতিহা'র উচ্চতর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

প্রথমে বুঝে নিতে হবে, এ সূরায় বেশকিছু মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা পূর্ণাঙ্গভাবে স্থান পেয়েছে :

১. এতে তিনটি নামে মহান মা'বূদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; (আল্লাহ তাআলার) আল-আসমাউল হুসনা ও উচ্চতর গুণসমূহের উৎস ও ভিত্তি হলো এ তিনটি নাম : আল্লাহ, রব ও রহমান। আর এ সূরার ভিত্তি রাখা হয়েছে ইলাহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত ও রহমতের ওপর।

সুতরাং ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ "আমরা কেবল তোমার দাসত্ব করি"—এটি আল্লাহ তাআলার 'ইলাহিয়্যাত'-নির্দেশক।

﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ "আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই"—এটি 'রুবূবিয়্যাত'-নির্দেশক।

আর তাঁর কাছে সরল পথের নির্দেশনা চাওয়া—এটি 'রহমত'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'প্রশংসা'র ভেতরও এ তিনটি বিষয় রয়েছে : আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলাহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত ও রহমত সবদিক দিয়েই প্রশংসিত। গুণকীর্তন ও মহিমা-প্রকাশ—এ দুটি হাম্‌দ বা প্রশংসাকে পূর্ণতা দেয়।

২. এ সূরা আখিরাতকে সাব্যস্ত করা, ভালো ও মন্দ কাজের ভিত্তিতে বান্দার আমলের প্রতিদান, সেদিন মহান রবের একক কর্তৃত্ব এবং তাঁর ইনসাফপূর্ণ বিচার—এসব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর এ সবগুলোই রয়েছে ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ "প্রতিদান দিবসের মালিক" আয়াতটির অধীনে।

৩. এ সূরায় বেশ কয়েকটি দিক দিয়ে নুবুওয়াতের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে :

ক) আল্লাহ তাআলা "মহাবিশ্বের অধিপতি" (رَبُّ الْعَالَمِيْنَ), সুতরাং তাঁর বান্দাদের অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া তাঁর শানের সঙ্গে মানানসই নয়। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য কোন জিনিস উপকারী আর কোন জিনিস ক্ষতিকর—সেসবের পরিচয় বান্দাদের সামনে তুলে ধরবেন না, এমন চিন্তা লালন করা মানে (আল্লাহ তাআলার) রুবূবিয়্যাতকে নাকচ করে দেওয়া এবং মহান রবের সঙ্গে এমন কিছু জুড়ে দেওয়া যা তাঁর সঙ্গে একেবারে বেমানান। যারা এ কাজ করে, তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি।

খ) তাঁর একটি নাম 'পরম করুণাময়' (اَلرَّحْمٰنُ)। তাঁর করুণা তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দিতে বাধা দেয়। কী করলে বান্দারা পূর্ণতার শিখরে পৌঁছুতে পারবে, তা তিনি বলবেন না—এমন ধারণাকেও 'করুণাময়' নাম বাধা দেয়। যে ব্যক্তি 'করুণাময়' শব্দটিকে যথাযথ অধিকার দেয়, সে জানে—বৃষ্টিবর্ষণ করা, তৃণলতা গজিয়ে তোলা ও বীজ থেকে চারা উদগত করা—এসব কাজের সঙ্গে 'রহমান' নামের যেটুকু সম্পর্ক, তার চেয়ে বেশি সম্পর্ক রাসূল পাঠানো ও কিতাব নাযিল করার সঙ্গে। দেহ ও বাহ্যিক সূরত সজীব রাখার জন্য আল্লাহর করুণা যেটুকু প্রয়োজন, কল্‌ব ও রূহকে সজীব রাখার জন্য আল্লাহর করুণার প্রয়োজন

তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। কিন্তু, যাদের চোখে পর্দা পড়ে আছে তারা 'করুণাময়' শব্দের মধ্যে জন্তুজানোয়ারের প্রয়োজন মেটানোর বিষয়টিই দেখতে পায়, আর বুদ্ধিমান লোকেরা এর মধ্যে তার চেয়েও বেশিকিছু দেখতে পায়।

গ) এ সূরায় 'প্রতিদান দিবস' (يَوْمُ الدِّيْنِ)-এর কথা বলা হয়েছে। কারণ সেদিন বান্দাদের আমল অনুযায়ী পাওনা পরিশোধ করা হবে—ভালো কাজের জন্য তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে আর অবাধ্যতা ও গুনাহের জন্য দেওয়া হবে শাস্তি। তবে, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার আগ-পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর শানে মানানসই নয়; প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় রাসূল ও আসমানি কিতাব পাঠানোর মাধ্যমে; তাদের পাঠানোর পরই পুরস্কার ও শাস্তি অবধারিত হয়ে ওঠে; তাদের ভিত্তিতেই বিচারের দিন 'হাঁকিয়ে নেওয়ার ঘটনা' ঘটবে—ভালো লোকদের নেওয়া হবে জান্নাতে আর গুনাহগারদের নেওয়া হবে জাহান্নামে।

ঘ) আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾ "আমাদের সরল পথ দেখাও"। হিদায়াত বা পথ-দেখানো মানে পথের বিবরণ ও নির্দেশনা দেওয়া, তারপর (সেই পথে) চলার সামর্থ্য ও প্রয়োজনীয় সংকেত দেওয়া, আর শেষের এ দুটি হয়ে থাকে পথের বিবরণ ও নির্দেশনা দেওয়ার পর। পথের বিবরণ ও নির্দেশনা দেওয়া—এ দুটি কাজ কেবল আল্লাহর প্রেরিত রাসূলদের দ্বারাই সম্ভব। পথের বিবরণ, নির্দেশনা ও পরিচয়—এসবের পরে আসে পথচলার সামর্থ্যের বিষয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়—আল্লাহর কাছে সরল পথের নির্দেশনা চাওয়া, বান্দার সব প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জরুরি। যারা বলে 'আমরা তো (কুরআনের মাধ্যমে) হিদায়াত পেয়ে গিয়েছি, আবার হিদায়াত চাইব কীভাবে?', তাদের এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, আল্লাহর নাযিল-করা হকের ব্যাপারে আমরা যা জানি, তার চেয়ে না-জানার পরিমাণ বহুগুণ বেশি। আমরা যা করতে চাই, পরিমাণে তার চেয়ে বেশি অথবা কম অথবা সমান হলো সেসব কাজ যা আমরা তুচ্ছ মনে করে ও অলসতার কারণে করতে চাই না। কিছু কাজ আমরা করতে চাই, কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে করতে পারি না এমন ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এসব বিষয়ের পূর্ণ ও বিস্তারিত চিত্র আমাদের সামনে নেই; তাই আমরা কী পরিমাণ কাজ করতে পারছি না, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আমাদের দরকার পরিপূর্ণ হিদায়াত। যে এসব বিষয় পরিপূর্ণভাবে হাসিল করতে পেরেছে, আল্লাহর কাছে তার হিদায়াত চাওয়ার উদ্দেশ্য হলো সে যেন হিদায়াতের ওপর অবিরামভাবে অটল ও অবিচল থাকতে পারে।

হিদায়াতের আরেকটি স্তর আছে, সেটি হলো এর সর্বশেষ স্তর। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন জান্নাতে যাওয়ার পথপ্রদর্শন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর সরল পথের দিশা পায়—যে সরল পথ দিয়ে তিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন আর কিতাব নাযিল করেছেন—, আখিরাতেও সে সরল পথের দিশা পাবে, যা তাকে জান্নাত ও পুরস্কার-গৃহে পৌঁছে দেবে। এ দুনিয়ায় আল্লাহর নির্ধারিত সরল পথের ওপর বান্দা যতটুকু অটল থাকবে, জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাতের ওপর সে ততটুকুই অটল থাকতে পারবে; দুনিয়ায় সরল পথে যে গতিতে সে চলেছে, পুলসিরাতেও তার গতি থাকবে ততটুকু: তাদের মধ্যে কেউ পার হবে বিজলির গতিতে, কেউ চোখের পলকে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ বাহনের গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ পায়ে

হেঁটে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ নতজানু হয়ে গায়ে অনেক আঁচড় লাগিয়ে, আবার কেউ নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।

যে ব্যক্তি পুলসিরাতে তার গতি কেমন হবে তা দেখতে চায় সে যেন এ দুনিয়ায় সীরাতে মুসতাকীমের ওপর তার গতি দিকে তাকায়। কারণ সেখানে সে হুবহু একই গতি প্রাপ্ত হবে, যা হবে তার যথাযথ পাওনা :

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

"তোমরা যা করছিলে, (আজ) কেবল তারই পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।"[৬]

ঙ) এ সূরায় অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোকদের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে গজবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট দুটি দল থেকে আলাদা করা হয়েছে। সত্যকে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা—এসবের ভিত্তিতে মানুষ এই তিনভাগে বিভক্ত। শারীআতের-আওতাধীন-মানুষ কখনো এ তিনশ্রেণির বাইরে যেতে পারে না। কারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত, কারা গজবের শিকার আর কারা পথভ্রষ্ট—এসব বিষয় নুবুওয়াত ও রিসালাতকে অপরিহার্য করে তোলে (অর্থাৎ, রিসালাত ছাড়া এসব বিষয় জানার কোনো সুযোগ নেই)।

৪. اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ-এ اَلصِّرَاطُ শব্দটি একবচন; পাশাপাশি একে দুদিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে: প্রথমবার (শুরুতে) আলিফ-লাম লাগিয়ে, আর দ্বিতীয়বার আরেকটি শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ করার মাধ্যমে। ফলে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ও বিশেষায়িত হয়েছে, অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকীম একটিই।

বিপরীতদিকে, গজব ও ভ্রষ্টতার পথগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা কখনো বহুবচন আবার কখনো একবচন ব্যবহার করেন; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

"এ হলো আমার-দেওয়া সিরাতে মুস্তাকীম, তোমরা এ পথ অনুসরণ করো; অনেক পথ অনুসরণ করো না, তা হলে সেগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে।"[৭]

এ আয়াতে আল্লাহ নিজের পথ বোঝাতে 'সিরাত' ও 'সাবীল' একবচন ব্যবহার করেছেন, আর এর বিপরীত পথগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন এর বহুবচন 'সুবুল'।

ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সামনে একটি রেখা টেনে বললেন,

هٰذَا سَبِيْلُ اللهِ

[৬] সূরা নাম্‌ল, ২৭ : ৯০।
[৭] সূরা আনআম, ৬ : ১৫৩।

“এটি আল্লাহর পথ”, তারপর এর ডানে-বামে কয়েকটি রেখা টেনে বললেন,

هٰذِهِ سُبُلٌ، عَلٰى كُلِّ سَبِيْلٍ شَيْطَانٌ يَدْعُوْ إِلَيْهِ

“এ হলো অনেক পথ, প্রত্যেকটি পথে একজন করে শয়তান আছে, সে ওই পথের দিকে ডাকছে।”

এরপর নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত পাঠ করেন:

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾

“এ হলো আমার-দেওয়া সিরাতে মুস্‌তাকীম, তোমরা এ পথ অনুসরণ করো; অনেক পথ অনুসরণ করো না, তা হলে সেগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে।” আল্লাহ তোমাদের এ নির্দেশ দিচ্ছে, যাতে তোমরা তার নাফরমানি থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারো।”[৮] [৯]

এর কারণ হলো—আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছানোর রাস্তা মাত্র একটি। আর সেটি ওই রাস্তা, যা দিয়ে তিনি তাঁর রাসূলদের পাঠিয়েছেন, যার বিবরণ দিয়ে তিনি আসমানি কিতাবগুলো নাযিল করেছেন; এ রাস্তা ছাড়া কেউ তাঁর কাছে পৌঁছুতে পারবে না। মানুষ যদি অন্যসব রাস্তায় গিয়ে প্রত্যেকটি দরজায় কড়া নাড়ে, তারা দেখবে—একপর্যায়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, ব্যতিক্রম কেবল এই একটি পথ, যা আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত, যা মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়।

সিরাতে মুস্‌তাকীম-সন্ধানী যেহেতু এমন এক বিষয়ের সন্ধানে নেমেছে, যা থেকে বেশিরভাগ মানুষ সরে যায়, সে যেহেতু এমন এক পথে চলতে চাচ্ছে, যে পথে বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম ও দুর্লভ, আর প্রকৃতিগতভাবেই একাকিত্ব মানুষের কাছে অপছন্দের এবং বন্ধুর প্রতি থাকে তার গভীর মমত্ববোধ ও ঘনিষ্ঠতা, তাই আল্লাহ তাআলা এ পথের বন্ধুদের ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন :

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾

“যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা থাকবে সেসব লোকের সঙ্গে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আর তারা হলেন নবি, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার বান্দাগণ; তারা অত্যন্ত চমৎকার বন্ধু।”[১০]

আল্লাহ তাআলা সিরাতে মুস্‌তাকীমকে সেসব বন্ধুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে দিয়েছেন, যারা এ পথের পথিক, যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, যাতে যে ব্যক্তি হিদায়াত খুঁজে ফিরে আর সীরাতে

---

[৮] সূরা আনআম, ৬ : ১৫৩।

[৯] দারিমি, ২০২; ইবনু মাজাহ, ১১।

[১০] সূরা নিসা, ৪ : ৬৯।

মুসতাকীমের ওপর চলতে চায়, তার মন থেকে যেন নিজ জামানার স্বজাতীয় লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বেদনা দূর হয়ে যায়, যাতে সে বুঝতে পারে—এ পথে তার বন্ধু হলো সেসব লোক যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; ফলে এ পথ-থেকে-সরে-যাওয়া লোকদের বিরোধিতাকে সে মোটেই পরোয়া করবে না, কারণ সংখ্যায় তারা বেশি হলেও মর্যাদায় তারা খুবই নগণ্য, যেমন পূর্ববর্তী মনীষীদের কোনো একজন বলেছিলেন—'সত্যপথে অটল থেকো, ওই পথের পথিক কম হলেও নিজেকে একা মনে কোরো না; আর মিথ্যার পথ থেকে দূরে থেকো, ধ্বংসের-পথে-পা-বাড়ানো লোকদের সংখ্যাধিক্য যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।' সিরাতে মুস্‌তাকীমে চলতে গিয়ে যদি কখনো নিজেকে বড্ড একা মনে হয়, তা হলে তোমার-আগে-চলে-যাওয়া বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা লালন কোরো, তাদের ছাড়া অন্যদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রেখো, কারণ আল্লাহর সামনে তারা তোমার কোনো উপকারে আসবে না, তোমার সিরাতে মুস্‌তাকীমের ওপর চলা দেখে তারা যতই চিৎকার চেঁচামেচি করুক, তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ কোরো না।

যেহেতু সিরাতে মুস্‌তাকীমের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দিক্‌নির্দেশনা চাওয়া হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, আর তার সন্ধান পাওয়া হলো আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান, তাই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে সেটি চাইতে হবে, তিনি তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন তারা যেন সিরাতে মুস্‌তাকীম চাওয়ার আগে তাঁর প্রশংসা-স্তুতি ও মহিমা বর্ণনা করে। এরপর তিনি তাঁর তাওহীদ ও ইবাদাত পাওয়ার অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন।

তাঁর নাম ও গুণসমূহের ওসীলা এবং তাঁর ইবাদাতের ওসীলা—এ দুটি হলো বান্দার কাঙ্ক্ষিত মানযিলে পৌঁছার মাধ্যম। এ দুটি ওসীলা থাকলে, দুআ কবুল না হয়ে পারে না।

***

দ্বিতীয় অধ্যায় :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾-এর মানযিলসমূহ

১ নং ভূমিকা : মানযিলসমূহের পূর্বকথা

মানযিলসমূহের স্তর ও সংখ্যা

সূফিয়ায়ে কেরাম ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾-এর মানযিলসমূহের ব্যাপারে অনেক আলোচনা করেছেন; আল্লাহর পথে চলা অবস্থায় অন্তর এক এক করে সেই মানযিলগুলো অতিক্রম করে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়।

তাদের কেউ কেউ এর মানযিলসমূহ গণনা করে এর এক হাজারটি মানযিল পেয়েছেন। কেউ কেউ পেয়েছেন একশটি আর কেউ পেয়েছেন এর চেয়ে বেশি কিংবা কম।

মানযিলসমূহ ও এর তারতীবের ব্যাপারে সূফিয়ায়ে কেরামের বেশ মতভেদ রয়েছে। প্রত্যেকেই আপন আপন অবস্থা ও পথচলা অনুসারে তা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু কিছু মানযিলের ক্ষেত্রে এই মতভেদও রয়েছে যে, তা মাকামের অন্তর্ভুক্ত নাকি হালের?

এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো : মাকাম হচ্ছে অর্জনযোগ্য আর হাল হচ্ছে আল্লাহ-প্রদত্ত।

তাদের কেউ কেউ বলেছেন, হাল হলো মাকামের ফল আর মাকাম হলো আমলের ফল। সুতরাং যে ব্যক্তির আমল উত্তম ও ভালো সে উচ্চ মাকামের অধিকারী। আর যে উচ্চ মাকামের অধিকারী তার হাল (অন্তরগত অবস্থা)-ও উচ্চ স্তরের হয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রে সঠিক অভিমত হলো মানযিলসমূহের অবস্থা অনুসারে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। সূচনা ও প্রাথমিক অবস্থায় এর ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি ও ঝলক প্রকাশ পায় যেমন দূর থেকে বজ্রমেঘের বেশ ঝলক ও দীপ্তি দেখা যায়। অতঃপর যখন বিষয়টি ব্যক্তির মাঝে এসে পড়ে তখন 'হাল'-এর সৃষ্টি হয়। এরপর যখন তা স্থায়ী ও দৃঢ়ভাবে স্থান করে নেয় তখন তা মাকাম-এ পরিণত হয়।

এটি প্রথমে ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তির পর্যায়ে থাকে, মাঝপথে তা হালে রূপান্তরিত হয় আর শেষে তা মাকামে পরিণত হয়। প্রথমে যেটি ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি ছিল পরবর্তী সময়ে হুবহু তা-ই হাল, আর হাল-ই এর পরে মাকামে পরিণত হয়। এই সমস্ত নাম হচ্ছে অন্তরের সাথে এর সম্পর্ক, প্রকাশমানতা ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে।

সালিক কখনো কখনো তার মাকাম থেকে বেরিয়ে যায় যেমন তার পরিহিত কাপড় থেকে বেরিয়ে যায় এবং আগের চেয়ে নিম্নস্তরের মাকামে অবতরণ করে। অতঃপর আবার কখনো সেখানে ফিরে আসতে পারে আবার কখনো পারে না।

মানযিলসমূহের ক্রমবিন্যাসে লেখকের তরীকা

আমাদের জন্য সর্বোত্তম হলো আমরা কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত ইবাদাত ও দাসত্বের মানযিলগুলো উল্লেখ করব এবং এর স্তর ও সীমানার পরিচয় তুলে ধরব। কারণ সেগুলো সম্পর্কে জানা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন তা জানাকে পূর্ণতা দান করে। আর যারা তা জানে না আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে মূর্খতা ও নিফাকের দোষে দোষী করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

اَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

"বেদুইন আরবরা কুফরি ও মুনাফিকিতে অত্যন্ত কঠোর এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি যা কিছু নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ থাকার আশঙ্কাই বেশি।"[১১]

সুতরাং প্রত্যেকে জন্য আবশ্যক হলো ইসলামের নির্ধারিত সীমারেখা সম্পর্কে গভীরভাবে জানা এবং খুব যত্নসহকারে তা পালন করা। তা হলে বান্দা এর মাধ্যমে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নেবে এবং সে ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾-এর গুণে গুণান্বিত বলে সাব্যস্ত হবে।

আমরা মানযিলসমূহের একটি ক্রমবিন্যাস উল্লেখ করব তবে তা অপরিহার্য কোনো বিষয় নয়; বরং উত্তমতার ভিত্তিতে এবং বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে তা উপস্থাপন করব। যাতে বিষয়টি উপলব্ধি করতে সুবিধা হয়, ভালোভাবে জানা যায় এবং সহজেই তা অর্জন করে নেওয়া যায়।

***

১ নং মানযিল : তাওবা (اَلتَّوْبَةُ)

তাওবাই হলো প্রথম ও শেষ মানযিল

তাওবার মানযিল হচ্ছে প্রথম, মধ্যম ও শেষ মানযিল। সুতরাং আল্লাহর পথের পথিক কখনো তাওবা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সে মৃত্যু পর্যন্ত এর মধ্যেই থাকে। যদি অন্য মানযিলে যায় তবে তাওবাকে সাথে

[১১] সূরা তাওবা, ৯ : ৯৭।

নিয়েই যায়, তাওবা হলো তার সবসময়ের সঙ্গী। এটিই বান্দার পথের শুরু, এটিই শেষ। তবে শুরুর সময়ের ন্যায় শেষ পর্যায়েও তাওবার প্রয়োজন তীব্র ও প্রকট আকার ধারণ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"[১২]

এটি সূরা নূরের একটি আয়াত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির সেরা মুমিন বান্দাদের সম্বোধন করে বলেছেন যে, তারা যেন তার নিকট তাওবা করে, ফিরে আসে। অথচ তারা ঈমান এনেছে, কাফিরদের দেওয়া অনেক কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করেছে, তাঁর পথে হিজরত করেছে এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে। অতঃপর সফলতাকে তাওবার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন; যেমন উপকরণকে উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। আল্লাহ তাআলা এখানে لَعَلَّ (আশা করা যায় বা হয়তো) ব্যবহার করেছেন—এটি বুঝানোর জন্য যে, তোমরা যখন তাওবা করবে তখন তোমাদের সফলতার আশা করা যায়। সুতরাং কেবল তাওবাকারী ব্যক্তিই সফলতার আশা করতে পারে, অন্য কেউ নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমীন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

"যারা তাওবা করে না তারাই জালিম বা অত্যাচারী।"[১৩]

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন : তাওবাকারী ও জালিম; এখানে তৃতীয় কোনো শ্রেণি নেই। যারা তাওবা করে না তাদেরকে তিনি জালিম বলেছেন। আসলে তার চেয়ে জালিম আর কেউ নেই। কারণ সে তার রব সম্পর্কে, রবের হক সম্পর্কে, নফসের দোষত্রুটি সম্পর্কে এবং তার আমলের কমতি ও বিপদাপদ সম্পর্কে অজ্ঞ, অকাট মূর্খ।

'সহীহ মুসলিম'-এ এসেছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"ওহে লোকসকল, তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো। আমি তো আল্লাহর নিকট প্রতিদিন একশ বার তাওবা করি।"[১৪]

---

[১২] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।

[১৩] সূরা হুজুরাত, ৪৭ : ১১।